।প্র।ব।ন্ধ।

বাংলাদেশের মঞ্চ-নাটক: হাস্যরস ও অশ্লীলতা

রাহমান চৌধুরী

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের শুরু থেকেই বারবার একটা কথা বলা হয়েছে যে, নাটক সমাজ সচেতনমূলক হওয়া চাই। নাট্যকারদের সামাজিক দায়িত্বসম্পন্ন হওয়া চাই। কিন্তু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পর এসে দেখতে পাচ্ছি, কোথায় সেটা? পুরো আন্দোলনই লক্ষ্যভ্রষ্ট। শম্ভু মিত্র লিখেছিলেন যে, 'যখন প্রথম শিল্পকর্মে জড়িয়ে পড়ি তখন অনেকটা যেন জৈব তাড়নায় শিল্পক্ষেত্রে আসি। নিজের আকাঙ্ক্ষার রূপ জানি না, তার উদ্দেশ্য জানি না, শুধু অন্ধকার গুহার দেয়ালে হাতড়ে মরি একটা ফাটল খুঁজে পাওয়ার আশায়। সেই সময় কতো মত আমাদের কতো পথে নিয়ে যায়।[১] স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। এই প্রচেষ্টা বা আন্দোলন কখনো স্থির থাকেনি। বারবার ধারা পাল্টেছে, বক্তব্য পাল্টেছে। অস্থিরভাবে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করেছে। নাটক শুরু হয়েছিলো নিয়মিত প্রদর্শনী করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং পুরানো নাট্যরীতির বিরুদ্ধতা করে। পরে নাটককে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কথা বলেছে, আরো পরে তাকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার করে তুলতে চেয়েছে। নাট্যচর্চা শেষ পর্যন্ত এখানেও থেমে থাকেনি। শ্রেণীসংগ্রাম বাদ দিয়ে তারা নাটককে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সপক্ষে গড়ে তুলতে চেয়েছে। পাশাপাশি তারা স্লোগান তুলেছে শেকড় সন্ধানের। সঙ্গে সঙ্গে আবার নাটককে করে তুলতে চেয়েছে পেশাদারী, জীবন-জীবিকার উপায়। বহু ধরনের স্লোগান তুললেও প্রকৃত অর্থে নাট্য আন্দোলন কোথাও এসে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সব প্রচেষ্টা, সব উদ্যোগই ব্যর্থ হয়েছে। উদ্যোগ যেমন ছিলো অনেক, ব্যর্থতাও তেমনি বিশাল।

বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন উনিশশ' আটানব্বই সালে গ্রুপ থিয়েটার

ZwiK Avbvg I Rwn` nvmvb we"Q bvU‡K

ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন ইউসুফ। তিনি লিখেছেন, মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশে নাটক একটি স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম হিসেবে স্বীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এ অর্জন। সামান্য পরেই আবার তিনি লিখেছেন, 'পঁচিশ বছরের উপান্তে দাঁড়িয়ে আজ নিজের মনেই প্রশ্ন জেগেছে, যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিলো আমাদের সামনে তার কতটুকু আমরা ব্যবহার করতে পেরেছি। নতুন কিছুই ঘটছে না, নতুন কিছু দেখছি না। আমাদের নাটক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে আছে। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা নয় যেন সযত্নে চ্যালেঞ্জকে পাশ কাটিয়ে নিরাপদ প্রযোজনা করা আমাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[২] তিনি আরো লিখেছেন, নির্লিপ্ত নির্বিকার নাট্য প্রযোজনা আমাদের থিয়েটারকে এক স্থবির জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।[৩] সন্দেহ নেই, বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন সারা দেশে নাট্যচর্চার আগ্রহ বাড়িয়েছে। দেশের বাইরে সম্মান অর্জন করেছে। দেশকে ভালো নাটক দেবার চেষ্টা করেছে। মহৎ প্রযোজনার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তার পরিধি কতটুকু? মূল কারণ খুঁজতে গেলে আমরা দেখবো, বাংলাদেশের যে নাট্য আন্দোলন, নাটক সেখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাটক হয়ে উঠতে পারেনি। তা হয়ে উঠেছিলো সস্তা স্লোগান।

স্বাধীনতার পরপর ঢাকা ও চট্টগ্রামে আমরা দেখতে পাই, হঠাৎ প্রচুর নাটক লেখা হয়। যেমন নাটকে আগ্রহী নতুনরা নাটক লিখতে আরম্ভ করেন, তেমনি পুরানো অনেক লেখক-সাহিত্যিকও হঠাৎ নাটক লেখার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। হঠাৎ করে এতো বেশি নাটক লেখা হতে আরম্ভ করে এবং এতো বেশি নাট্যকারের দেখা মিলতে শুরু

করে যে, এই প্রাচুর্য দেখে নাট্যকার নূরুল করিম নাসিম লিখেছিলেন, 'আমাদের এখানে এক সময় সাহিত্য জগতে কবিতার চেয়ে কবির সংখ্যা দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। তখন অকবিদের ভিড়ে আসল কবিকে চিনে নিতে কষ্ট হতো। এখন যেন সেই রকম একটা সময় এসে গেছে। অনাট্যকারদের ভিড়ে আসল নাট্যকার চিনে নিতে ভুল হয়।'[৪] সাতাত্তর সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত জাতীয় নাট্যোৎসবের নাটকগুলো দেখে জনৈক 'থিয়েটার' পত্রিকায় লেখেন যে, বাংলাদেশে নাটকের নামে কত রকম পাগলামী চলছে তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেছে। এ্যাবস্ট্রাক্ট, এ্যাবসার্ড, সামাজিক, নৈতিক, ঐতিহাসিক এবং জগাখিচুড়িএমনি নানা ধরনের নাটক দেখে একটা ধারণা করা গেছেবাংলাদেশের নাটক মোটামুটি হাঁটতে শিখেছে, কিন্তু চোখ ফোটেনি। অন্ধের মতো চলছে, ঠোক্কর খাচ্ছে, মাথা ফাটাচ্ছে। তিনি আরো লিখছেন, **রেভ্যুলিউশন ও খৃষ্টাব্দ সন্ধান** এবং **এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা** নিয়ে বাহাত্তরে এক ধরনের নাটক 'বদর বদর' বলে দাঁড় ফেললো ঠিকই, তবে সে সময় নাট্যচক্রের উদ্ধত তরুণেরা জানতো না, কোথায় তারা যেতে চায়। বর্তমানের পরস্পর অলিখিত প্রতিযোগী নাটুকে দলগুলোও জানে না কোথায় তারা যাবে। তবু যে যতো জোরে পারছে হাঁক মারছে, 'বদর বদর'।[৫]

সামাজিক অঙ্গীকারের প্রশ্নে লক্ষ্যহীনভাবেই আসলে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিলো। স্বাধীনতার পরপর যাঁরা বাংলাদেশের নাট্যচর্চা শুরু করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে শাহরিয়ার কবির পঁচাত্তর সালে লিখেছেন, 'শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমে চমক সৃষ্টি করার অবকাশ তখন খুব কমই ছিল। কারণ বিভিন্ন মাধ্যমে আগে থেকে অনেকে এমন জাঁকিয়ে বসেছিলেন যে সদ্য অভিজ্ঞ এই তরুণরা সেখানে কিছু করার সুযোগ পাননি। তাই তাঁরা নাটক নিয়ে মেতে উঠলেন।'[৬] সেখানে সামাজিক প্রশ্ন যে একেবারে আসেনি তা নয়। প্রবলভাবেই অনেক সময় নাটকে সামাজিক প্রশ্ন ধরা পড়েছে, তবে তার পেছনে কোনো সমাজবিজ্ঞানের চেতনা ছিলো না। একটি রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলন গড়ে তুলবে তেমন চিন্তাও নাট্যকর্মীদের মধ্যে দেখা যায়নি। সেখানে যে-যার মতো নাট্যচর্চায় মেতে ছিলো। শাহরিয়ার কবির লিখেছেন, 'বুর্জোয়া শিল্পকর্মী শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে অহরহ যে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে চলেছেন, আমাদের অধিকাংশ শিল্পীই সেই ধারণা থেকে মুক্ত নন। এঁরা কখনো বলেন শিল্পের জন্য শিল্প, কখনো মানুষকে ভালোবাসার জন্য শিল্প রচনা করেন, কখনো রাজনীতি-নিরপেক্ষ শিল্প সৃষ্টি করেন, কখনো বাস্তবতার হুবহু প্রতিফলনকে শিল্প বলেন, কখনো বা বলেন, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যই হচ্ছে শিল্প বিচারের মাপকাঠি। আসলে এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পের কর্মী যারা প্রগতির বিপরীতে কাজ করে যাচ্ছেন।'[৭]

শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক প্রভাব প্রশ্নে প্লেটো মনে করতেন, শিল্প-সাহিত্যের সুফল এবং কুফল দুই-ই আছে। মানুষকে কোনো একদিকে বিগড়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্প যা হোক একটা কিছু শিক্ষা দেয় এবং সেটা কুশিক্ষাও হতে পারে। প্লেটোর নানা লেখায় এই কথা বারবার বলা হয়েছে, শিল্প যেহেতু আনন্দ দেয়, তার পক্ষে কুশিক্ষা দেয়া আরো সহজ। যদি আমরা শিল্পকলার ইতিহাস বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো প্লেটো কিছু ভুল বলেননি। শিল্পকলার নানা রকম চরিত্র আমরা দেখতে পাই। শিল্পকলা কখনো শাসকশ্রেণীর হাতিয়ার, কখনো তা জনগণের হাতিয়ার। শিল্পকে কখনো শাসকরা ব্যবহার করেছেন তাদের মতবাদ মানুষের মাথায় ঢোকাবার জন্য, কখনো শিল্পকলা হয়ে উঠেছে জনগণের লড়াইয়ের ভাষা। শিল্পকলা একই সাথে দুটো ভূমিকাই পালন করছে, শাসক ও শোষক উভয়ের পক্ষেই সে দাঁড়াচ্ছে। যেমন শেক্সপিয়ারের নাটক। যুগের দ্বন্দ্ব কীভাবে নাটকে ফুটে ওঠে তা বুঝতে হলে শেক্সপিয়ারের যুগ এবং তার নাটকগুলোকে আমাদের একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে। শেক্সপিয়ারের যুগ ছিলো বণিকতন্ত্রের যুগ। বণিকদের কাছে পৃথিবীটা একটা বাজার ছাড়া কিছুই নয় এবং তার উদ্দেশ্য সব সময় হীন জঘন্য মুনাফা লাভ। মুনাফার স্বার্থেই সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়েছে, যন্ত্রের উন্নতি ঘটিয়েছে, নতুন নতুন দেশ জয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। ব্যক্তি নিরপেক্ষ, উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ বিচারে বুর্জোয়ার উত্থান এক মহান প্রগতিশীল অধ্যায়। কিন্তু শেক্সপিয়ার মুনাফালোভী প্রগতিশীল উঠতি বুর্জোয়াকে বরণ করতে পারেননি আবার পচা সামন্ততান্ত্রিক সমাজকেও গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়েছিলো। সেজন্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে যেমন তাঁর নাটকে তীব্র আক্রমণ রয়েছে, তেমনি বুর্জোয়া বণিকদের বিরুদ্ধেও তিনি কলম ধরেছেন। ধর্মীয় আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করায় যেমন তিনি ধর্মকে বর্জন করতে পারেননি, তেমনি আবার ধর্মের কুসংস্কার, পুরোহিতদের সম্পদ-লালসা, ধর্মীয় গির্জার কর্তৃত্বকে সমর্থন দিতে পারেননি। পাশাপাশি সে সময়কার প্রোটেস্টান্টদের দ্বারা ক্যাথলিকদের প্রতি অত্যাচার হতে দেখে তিনি ক্যাথলিকদের পক্ষ নিয়েছিলেন। যে সমাজে শেক্সপিয়ার বাস করতেন এবং যে শ্রেণীর তিনি মুখপাত্র এবং ইতিহাসের যে সময়কালে তিনি কলম ধরেছিলেন–সবই তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিলো।

শিল্পকলা তাহলে শাসক ও শোষক উভয়ের স্বার্থকেই রক্ষা করতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো যা ঘটে তাহলো, শিল্পকলার নামে যা তৈরি হয় তা আদৌ কোনো শিল্পকলাই হয়ে ওঠে না। শাসক বা শোষকের পক্ষে দাঁড়ানো তো পরের কথা, শিল্পকলার নামে তৈরি করা হয় নির্বীজ ও অরুচিকর সস্তা কিছু। বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্র যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। বহু টাকা ব্যয় করে শিল্পকলা বা চলচ্চিত্রের নামে তৈরি করা হয় নানা আবর্জনা, যা মানুষের কুরুচিকেই প্রভাবিত করে। যা উৎকট গন্ধ ছড়ায়। প্লেটো তাই ঠিকই বলেছিলেন, শিল্পকলার নামে মানুষকে কুশিক্ষাও দেয়া চলে। ফলে 'শিল্পকলা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার', 'শিল্পকলা সমাজকে সুন্দর করে', 'নান্দনিক বোধের জন্ম দেয়' ইত্যকার ঘোষণা দেয়ার পাশাপাশি স্মরণ রাখা দরকার, শিল্পকলা যদি কলা না হয়ে ওঠে তবে নানা ব্যাধিও ছড়াতে পারে। এবং শিল্পকলার নামে আমরা যা করি তা সব সময় শিল্প হয়েও ওঠে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী নাটকের ইতিহাসে চোখ বুলালে দেখা যাবে, শিল্পকলার বিচারে বহু নাটকই নাটক হয়ে ওঠেনি। তা শুধু উৎকট গন্ধ ছড়িয়েছে। প্লেটোর ভাষায় নাটক নানা কুশিক্ষাও দিয়েছে।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে মামুনুর রশীদ বাংলাদেশের নাটক সম্পর্কে বলেছেন, 'নাটকগুলোতে বর্তমানে একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে, নাটকগুলোকে খুব স্থূল হাস্যরসাত্মক করা হচ্ছে। দর্শক খাবে কিনা এই চিন্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে'।[৮] মামুনুর রশীদ সঠিক বলেছিলেন। তবে শুধু নব্বইয়ের দশকে নয়, নাট্যান্দলনের শুরুতেও আমরা কম-বেশি লোক হাসাতে দেখেছি বহু দলকে। বিশেষ করে ব্রেশটের রাজনৈতিক নাটককে পর্যন্ত সস্তা হাসির উপাদানে পরিণত করা হয়েছিলো। সত্তরের দশকে ব্রেশটের রাজনৈতিক নাটককে হাসির মোড়কে ভরে দর্শকদের বিনোদন দিয়েছিলো নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় তাদের দু-দুটো প্রযোজনায়। ব্রেশটের নাটক ঢাকায় প্রথম মঞ্চস্থ করার কৃতিত্ব নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের। ব্রেশটের **গুড উওম্যান অব সেৎজুয়ান** ও **হের পুন্টিলা এন্ড হিজ ম্যান মাট্টি** নাটক দুটির রূপান্তর **সৎ মানুষের খোঁজে** ও **দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা** নাগরিক সত্তর দশকেই মঞ্চস্থ করে। মঞ্চায়িত তাদের নাটক দুটির প্রযোজনা সম্পর্কে সমালোচনা ছিলো, ব্রেশটের নাটকের রাজনীতি বাদ দিয়ে শুধু গল্পের কাঠামো ও হাসি-তামাশাগুলোই দর্শকদের মনোরঞ্জনে তারা ব্যবহার করেছিলো। চিন্ময় মুৎসুদ্দী লিখছেন, ব্রেশট সমাজ সচেতন নাট্যকার, বক্তব্যহীন নাটক তিনি লেখেননি। কিন্তু নাগরিকের দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা নাটকে ব্রেশটের বক্তব্য অপ্রধান হয়ে গেছে, নাটকের মূল বক্তব্য বাদ দিয়ে দেওয়ান গাজীকে প্রধান করে তোলা হয়েছে। মূল নাটকের যে দ্বন্দ্ব তা এ নাটকে পাওয়া যায় না। নাগরিককে মনে

রাখতে হবে জনপ্রিয়তাই মহৎ শিল্পের একমাত্র উপাদান নয়।[৯] নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের মতোই বহুবচন নাট্যদল তাদের প্রযোজনায় ব্রেশটের **থ্রি পেনি অপেরা** নাটকের মূল বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে তাকে শুধুই হৈ চৈ আর হাসি-তামাশার ব্যাপারে পরিণত করেছিলো। সস্তা নাটক করার প্রবণতা, দর্শক মাতানো–এসব আসলে শুরু থেকেই নাট্য আন্দোলনে লক্ষ্য করা গিয়েছিলো।

হাসির নাটক বা উল্লেখিত সস্তা নাটকগুলো আশির দশকের শেষার্ধ থেকে আরো গুরুত্ব পেল এ কারণে যে, হাসির নাটক হলেই দর্শক পাওয়া যায়। কোন ধরনের দর্শক সেটা বড় কথা নয়, নাট্য দলগুলোর কাছে যেটা বিবেচ্য তা হলো অধিক সংখ্যায় প্রবেশপত্র বিক্রি করে 'প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ' করা। নাটকের বিষয়বস্তু সেখানে প্রধান নয়, দর্শককে আকৃষ্ট করাই মূল কথা। সেজন্য নব্বইয়ের দশকেই আতাউর রহমান একবার লিখেছিলেন, 'পণ্য থিয়েটারের পদধ্বনি ইতিমধ্যে আমরা অল্প বিস্তর শুনতে আরম্ভ করেছি'।[১০] নব্বইয়ের দশকেই নাগরিক প্রকাশিত নাট্যপত্রে লেখা হলো, নাট্যোন্দলনের শিল্পীরা আগের মতো আর আদর্শের পেছনে নেই। নৈরাশ্য, প্রাচুর্যের লোভ, রাতারাতি টিভি-নক্ষত্র বনে যাওয়ার হীন প্রচেষ্টা, বিজ্ঞাপনে পণ্যের মডেল সাজা এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা তাঁদের সামগ্রিকভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং একদা মঞ্চের প্রতি বিশ্বস্ত ও অঙ্গীকারবদ্ধ নাট্যশিল্পীরাও তাঁদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন। নাটকের কোনো দর্শন বা আদর্শ কাউকে আর আকর্ষণ করছে না বরং সস্তা জনপ্রিয়তার পথে তাঁরা ছুটে বেড়াচ্ছেন। যে কোনোভাবে 'টাকা' আয় তাঁদেরকে তাড়িত করছে। ফলে বাংলাদেশের নাটক বিশেষ শ্রেণীর দর্শকের চাহিদা পূরণে সক্ষম হলেও মূল লক্ষ্যের দিকে এগুতে পারেনি, ক্রমশ স্থবির হয়ে পড়ছে।[১১]

নব্বইয়ের দশকের নাট্যচর্চায় লক্ষ্য করা যায়, নাট্যদলগুলোর কাছে 'হাসির নাটক' খুব গুরুত্ব পেতে শুরু করে। বিশেষ করে আশির দশকের শেষ দিক থেকে পুরো নব্বইয়ের দশকের এটি ছিলো নাট্যচর্চার আর একটি প্রধান প্রবণতা। সেই প্রবণতার মূল কারণ ছিলো দর্শকের মনোরঞ্জন করা। সে সময় বাংলাদেশে হাসির নাটকের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠেন ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের। মলিয়েরের নাটককে ঘিরে নব্বইয়ের দশকে শুরু হলো ভিন্ন একটি পথ যাত্রা। দর্শককে সচেতন করে তোলার চেয়ে বিনোদনে ভাসিয়ে দেয়াটাই হলো বহু দলের প্রধান লক্ষ্য। লোকনাট্য দলের **কঞ্জুস**, নাট্যকেন্দ্রের **বিচ্ছু**, নাট্যচক্রের **ভদ্দরনোক**, দৃষ্টিপাত নাট্য সম্পদায়ের **বুদ্ধু**, কুশীলব নাট্য সম্প্রদায়ের **গিঠঠু**, মঞ্চ মুকুট নাট্য সম্প্রদায়ের **ভালোবাসা কারে কয়**, সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর **তারতুফ** মঞ্চস্থ হওয়ার ভেতর দিয়ে যা প্রমাণ করে। মলিয়েরের নাটকের ঘন ঘন প্রযোজনা দেখে শম্ভু মিত্রের একটি গল্পের কথা মনে পড়ে। বহুদিন আগে এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে জমিদার বাড়িতে আমন্ত্রণ করে যাত্রা দেখার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। যাত্রায় রাম এলো, সীতা এলো, দশরথ বিলাপ করলো কিন্তু সাহেব বাংলা বোঝে না, তাই নাক ডাকতে শুরু করলো। এমন সময় লম্বা লেজ নিয়ে হনুমান প্রবেশ করতে দেখে ছোটরা কলরব করে উঠলো। সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি এতক্ষণ পর হনুমানের লেজ নাড়ায় কিছুটা রস গ্রহণের স্বাদ পেলেন এবং খুশি হয়ে হনুমানকে দশ টাকা বখশিশ দিলেন। হনুমান ফের মঞ্চে এসে আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় পশ্চাৎদেশ আন্দোলিত করে লেজ নাড়লো। সাহেব এবারও কড়া হাততালি দিলেন। যাত্রার মূল বিষয় বাদ দিয়ে তখন সাহেবকে খুশি করতে লেগে গেল সবাই। সাহেবকে খুশি করার জন্য এরপর রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এমনকি সীতাও লেজ লাগিয়ে আসরে নামলো দর্শকদের মাত করতে। হয়তো এটা একটা গল্প। কিন্তু এর ভেতর দিয়েই আমাদের শিল্পচর্চা বা নাট্যচর্চার চেহারাটা বোঝা যাবে। সকল দলই মলিয়ের নামের লেজ লাগিয়ে দর্শক হাসাতে লেগে গেল। সমাজচিন্তা, দায়দায়িত্ব কোথায় উবে গেল।

কঞ্জুস নাটকের হাস্যরসাত্ম দৃশ্য

যদিও নব্বইয়ের দশকের আগে মলিয়ের দু-একবার মঞ্চস্থ হয়েছে তবে দর্শকদের কাছে তা তেমন আদরণীয় হয়নি। দর্শকদের মধ্যে তখন রুচিবোধ ছিলো এবং দর্শকরা সমাজচিন্তামূলক নাটক দেখতেই তখন আগ্রহী ছিলো। নব্বইয়ের দশকে মলিয়েরের নাটক খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে দর্শকদের মধ্যে। মলিয়েরের হাসির নাটকে দর্শক হয়ে উঠেছিলো মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত কিছু ফূর্তিবাজ লোক। মামুনুর রশীদ লিখেছেন, 'দেখা গেল চটুল হাস্যরসাত্মক হালকা নাটক দেখে দর্শক হাসছে। নাটক দেখছে এবং বাইরে এসে মন্তব্য শুনে অশিক্ষিত কিছু ডিগ্রিধারীর প্রতি করুণা হচ্ছে'।[১২] দর্শক নাটক দেখবার আগে জানতে চায় বিষয়বস্তু কী, জানতে চায় নাটকটি হাসির কিনা। হাসির নাটক দেখার জন্যই, শুধু বিনোদন লাভের জন্যই তারা নাটক দেখতে আসতে লাগলো। নাট্যদলগুলোও দর্শকদের সেই চাহিদা মেটানোর জন্য নাটকে হাসি বিতরণ করতে লাগলো। এসব নাট্যদলই একদা ঘোষণা দিয়েছিলো, শিল্প শিল্পের জন্য নয় এবং নাটকের কাজ শুধু বিনোদন বিতরণ করা নয়। যারা শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা দিয়েছিলো তারাও এই পথের পথিক হলো। সেই অবস্থায় বহু নাট্যদলের মধ্যেই টিকে থাকার সংগ্রামটাই প্রধান হলোগুরুত্বপূর্ণ অনেক দলও এই প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারলো না। মলিয়েরের নাটক এ অবস্থাতেই বাংলাদেশের নাটকে বিরাট জায়গা করে নিলো। ১৯৯৮ সালে আতাউর রহমান এক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের কথা আলাদাভাবে বলা দরকার। মলিয়ের বর্তমান বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। অনেকে বলেন বেশ কিছু নাট্যগোষ্ঠী, বিশেষ করে ঢাকা শহরে মলিয়েরকে নষ্ট বা বিকৃত করে জনপ্রিয়তার ক্যাপসুলে ভরে বিক্রি করছে।'[১৩]

মলিয়ের সম্পর্কে গণনাট্য গ্রন্থে রম্যাঁ রলাঁ লিখেছিলেন যে, বুর্জোয়াদের থেকে মলিয়েরের দৃষ্টি অনেক বেশি প্রসারিত ছিলো জনগণের প্রতি, তবে শ্রেণীসংক্রান্ত চিন্তাভাবনা সব সময় মলিয়েরের সঙ্গে মেলে না। তিনি একই প্রসঙ্গে লিখছেন, হাসি হলো একটা শক্তি, এবং লাম্পট্যের প্রতি সুচতুর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ সে ক্ষেত্রে কারণটাকে যুক্তিযুক্ত করে তোলে। কিন্তু মলিয়েরের মধ্যে আমরা যেটা পাই না সেটা হলো কাজে নামার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। তিনি দেখাচ্ছেন যে, মলিয়েরের নাটক সমাজ ও

জীবনকে বিশ্লেষণ করার চেয়ে জীবনকে ভরিয়ে দেয় হৈ-হুল্লোড়ের মত্ততায়। দর্শকরা আবিষ্ট হয়ে থাকে মঞ্চে ঘটে যাওয়া ঘটনার তোড়ে। সেজন্য রঁম্যা রলাঁর মন্তব্য, জনগণ যদি মলিয়েরের কাছ থেকে কিছুই না পায় শুধু নিচুমানের কমেডি ছাড়া, তাহলে তার প্রয়োজনটা কি? জনগণ হয়ত লাভবান হতে পারে ভাষার দিক থেকে, ভালো ভাষার ব্যবহারে; তাতে চেতনার বিকাশ কিছু ঘটবে না, মলিয়েরও ছুঁতে পারবেন না তাদের। তিনি মনে করেন, মলিয়েরের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী নাটকগুলো দর্শকদের বিচলিত বা উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা রাখে না, দর্শকদের ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাতে পারে না।[১৪]

শুধু হাসির নাটক কখনোই কোনো মহৎ নাট্যকারের অনুমোদন পায়নি। প্রাচীন গ্রিসের কমেডির মধ্যে যে কী পরিমাণ রাজনীতি ছিলো **ভেক** নাটকে তা আমরা দেখতে পাই। চেকভ নিজের হাসির নাটকগুলোকে সস্তা প্রমোদকরণের বেশি মূল্য দেননি। স্থূল জনরুচিকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন নিজের মঞ্চায়িত হাসির নাটকগুলোর প্রশ্নেই। চেকভের **দি বিয়ার** বিপুল সাড়া ফেলেছিলো দর্শকদের মধ্যে হাসির জন্য, প্রথম জীবনে অর্থোপার্জনের জন্য তিনি সে নাটকটি লিখেছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি সেগুলোকে নিজের বুদ্ধিহীনতা ছাড়া আর কিছুই মনে করতেন না। দর্শকদের রুচির সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, মূঢ়তায় ভরা নাটক বলেই তাঁর দি বিয়ার আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে।[১৫] মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত দুটো প্রহসন হলো **বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ** ও **একেই কি বলে সভ্যতা**। মধুসূদনের বন্ধুরা নাটক দুটির প্রশংসা করলেও তিনি নিজে নাটক দুটি লেখার পর ভাবিত হয়ে পড়েন। এমন চিন্তাও তাঁর মনে আসে যে, নাটক দুটি লেখা তাঁর আদৌ উচিত হয়নি। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন, নাটক দুটিকে তিনি প্রকাশের অনুমতি দেবেন কি-না ভাবছেন। তিনি সে চিঠিতে আরো লেখেন যে, জাতীয় নাট্যরীতি গড়ে তুলবার জন্য প্রথম ধ্রুপদী নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়েই দর্শকদের রুচি গড়ে তুলতে হবে। দর্শকদের রুচি গড়ে না ওঠার আগে কোনোভাবেই প্রহসন মঞ্চায়ন করা উচিত নয়।[১৬]

ব্রেশটের রাজনৈতিক নাটকেও হাসির ব্যাপার আছে তবে হাসিটা সেখানে প্রধান নয়, রাজনীতিটাই প্রধান। বুর্জোয়া সমাজকে হাস্যকর করে তোলার জন্যই নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ব্রেশটের নাটকে হাসির উদ্রেক করে। রাজনৈতিক বক্তব্য ছাড়া নিছক হাসির ব্যাপার সেখানে নেই। ব্রেশট তাঁর নাটকে মানুষকে প্রচুর হাসিয়েছেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্যটা কী ছিলো? মানুষ সম্পর্কে বস্তুবাদী ধারণার প্রচার, যুক্তির প্রাথমিক গুরুত্ব তুলে ধরা এবং জগৎকে বদলাবার প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করা। ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে ব্রেশট যখন গোটা সমাজকে বুঝতে শিখলেন, সমাজের নানা বৈপরীত্যকে তিনি ব্যঙ্গ করলেন হাসির মধ্যে দিয়ে। চ্যাপলিনও তাঁর ছবিতে তাই করেছেন। লোক হাসাবার আগে তাই তাঁদেরকে জগতের, মানুষের মধ্যকার নানা বৈপরীত্যকে বুঝতে হয়েছিলো। চ্যাপলিন লিখছেন, কমেডি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কঠিন শিক্ষণীয় জিনিস। সমগ্র অভিনয় শিল্পে এমন কোনো অভিনয় নেই যেখানে কমেডির মতো এমন নিখুঁত ও মানব চরিত্র সম্বন্ধে এমন সহানুভূতিশীল জ্ঞান থাকা দরকার। কমেডিতে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষকে খুব গভীরভাবে অনুধাবন করার ক্ষমতা।[১৭] সমাজকে হাস্যরসের মধ্যে প্রকাশ করতে চাইলে দরকার সমাজটাকে ভালো করে বোঝা, মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝা এবং সর্বোপরি অর্থনীতি কী করে মানুষের মনের ওপর প্রভাব ফেলে তা জানা। সমাজের ভেতরকার দ্বন্দ্বগুলোকে ধরতে পারা। চ্যাপলিন খুব ভালো অর্থনীতি বুঝতেন এবং সমাজের দ্বন্দ্বগুলো ধরতে পারতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে যখন দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, চ্যাপলিন তখন মানুষকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। জার্মানিতে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন এবং মনের কথা খুলে বলেন। চ্যাপলিনের সব কথা শুনে আইনস্টাইন অবাক হয়ে বললেন, 'কে বলে আপনি কমেডিয়ান, আপনি তো দেখছি পুরোদস্তুর অর্থনীতিবিদ।'[১৮] চ্যাপলিন সমাজনীতি-অর্থনীতি বুঝতেন বলেই জনগণের শিল্প তৈরি করতে পেরেছিলেন। সেজন্যই তাঁর ছবিতে শুধু লোক হাসানোর ব্যাপার ছিলো না। এর ভেতর দিয়ে তিনি সমাজ সত্য তুলে ধরেছেন।

মানুষের অনুভবের যে গভীর অবচেতন স্তর রয়েছে সেইখান থেকে শিল্পের রূপ নির্ধারিত হয়। মানুষের পূর্বজ্ঞান, মানুষের আহরিত অভিজ্ঞতাই সেই অবচেতন স্তর তৈরি করে দেয়। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে তা তৈরি হতে পারে না। ব্রেশট মনে করতেন যিনি রাজনীতি, অর্থনীতি বোঝেন না, তার পক্ষে আধুনিককালে নাটক লিখতে পারাই সম্ভব নয়। মার্কসবাদ থেকে ব্রেশট পেয়েছিলেন এক বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গি, সেই চোখেই তিনি দেখেছেন জগৎ ও জীবনকে। নাটকে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে তাকেই উপস্থাপন করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজে টাকার মাহাত্ম্য, মানুষের লোভ-লালসা, কেনা-বেচা সব কিছুকে তিনি হাস্যকর করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু সেখানে শুধু হাসি নয়, রয়েছে সমাজ সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ, মানুষের যন্ত্রণার কথা। বিনোদন সর্বস্ব আত্মমগ্ন শিল্পের বদলে ব্রেশট চেয়েছেন মননের উপকরণ, যা মানুষের চিন্তার জগতে নাড়া দেবে। হাসির মধ্যে দিয়ে সবকিছু শেষ হবে না। হাসতে হাসতে এক সময় চিন্তার জগতে ফিরবে দর্শক এবং সমাজ সম্পর্কে ভাবতে চাইবে। ব্রেশট বলেছেন এক সাক্ষাৎকারে, সবকিছুর পর আমি পৌঁছাতে চাই যুক্তির কাছে। ব্রেশট সকল হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে যুক্তির কাছেই পৌঁছাতে চেয়েছেন। বার্নার্ড শ'ও তাই চাইতেন। বার্নার্ড শ'র নাট্যকর্ম তাঁর সমকালীনদের চেয়ে অনেক বড় মাপের কারণ তাঁর কাজ নিঃসন্দেহে পৌঁছাতে চায় যুক্তির কাছে। তাই বলে কি তাঁর নাটক থেকে দর্শকরা বিনোদন পায়নি? বার্নার্ড শ'র নাটক ধাক্কা মারে দর্শকের বিচার বুদ্ধির দরজায়। তাঁর নাটকে হাসি থাকে, তবে আবেগের উচ্ছ্বাস থাকে না। দর্শককে তিনি ঘুম পাড়াতে চান না, দর্শকের মস্তিষ্ককে জাগিয়ে রাখতে চান।

নিছক হাসির বিরুদ্ধে চার্লি চ্যাপলিনও বক্তব্য রেখেছিলেন। মঁশিয়ে ভের্দু ছবি করার পর তিনি বলেছিলেন, এতোদিন যা করেছি তার সব কিছুতেই ফাঁকি দিয়েছি, জীবনের তরল দিকটাই তাতে শুধু প্রকাশ পেয়েছে। শিল্প-সাহিত্যে জীবনের গভীর দিকগুলোকেই ফুটিয়ে তোলা দরকার। বিদ্রূপ, সংবেদনশীলতা ও চমৎকারিত্বের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন আঙ্গিক তৈরি করলেন চলচ্চিত্র শিল্পে সমাজকে বিশ্লেষণ করার। হাসির আবরণে চ্যাপলিন কটাক্ষ করলেন গর্বস্ফীত সমাজের গোটা ব্যবস্থাকে। ব্যঙ্গ করলেন সামাজিক বৈষম্যকে, ঠুনকো অভিজাত্যবোধকে, ওপর তলার ঔদ্ধত্য, শঠতা আর মিথ্যা ভড়ংকে। প্রথমদিকে সবই করলেন কৌতুকরস সৃষ্টির মূল সূত্রটিকে অবলম্বন করে। হাস্যরস প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তিনি রূপায়িত করলেন তাঁর জীবন দর্শন। মানুষের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহও কখনো কখনো স্থান পেল সেই হাস্যরসের মধ্যে। চ্যাপলিনের গোড়ার প্রহসনগুলোতে সমাজকে তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে। দারিদ্র্যের প্রতি আছে সেখানে অপার মমতা, ধনীর প্রতি আছে শ্লেষ, প্রেমের প্রতি আছে সহানুভূতি–সেই ভাবালুতাকে কাটিয়ে চ্যাপলিন দৃঢ় পদক্ষেপে ভের্দুর রাজনীতিতে এসে উপনীত হলেন। যার শুরু মডার্ন টাইমস-এ। মডার্ন টাইমস-এর মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদের ভয়ঙ্কর চেহারাটা এবং শ্রমিকদের দুর্দশার কথা বললেন। হাসির আড়ালে যে একটা যুগের গভীর ট্র্যাজিডি লুকিয়ে রয়েছে তার সুরও দর্শকের মর্মে গিয়ে পৌঁছুলো।

বহুদিন সবাইকে হাসিয়ে তারপর যখন তিনি **গ্রেট ডিকটেটর** নির্মাণ করেন, তিনি স্পষ্ট করেই সকলকে জানিয়ে দিলেন দীর্ঘকাল হাসির ছবি করে সভ্যতার দারুণ দুর্দিনে বক্তব্য প্রকাশের তাগিদই তিনি অনুভব করছেন। এই ঘোষণার পর যারা প্রগতি বিরুদ্ধ তারা ক্ষেপে গিয়েছিলো চ্যাপলিনের উপর।[১৯]

সমাজপতিরা নানারকম ভয়ভীতি দেখালেন। কিন্তু চ্যাপলিন লিখছেন, ছবিটা আমার অস্ত্র, ছবির ভিতর দিয়েই আমি আমার মনের কথা বলবো। কার কী মনে হলো তাতে আমার কিছু আসে যায় না। এই হলো চ্যাপলিন। সমাজ বিশ্লেষণ বা সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলাটাই তাঁর কাছে প্রধান, হাসিটা নয়। সেজন্য হাসির জায়গা থেকে বের হয়ে এসে তৈরি করলেন মঁশিয়ে ভের্দু। মানুষের জন্য তাঁর গভীর ভাবনা-বেদনা মঁশিয়ে ভের্দুতে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলো। মঁশিয়ে ভের্দু হচ্ছে চ্যাপলিনের সমাজচেতনার পরিপূর্ণ প্রকাশ, শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের দ্বিধাহীন ঘোষণা। চ্যাপলিন তখন আর ভাসা ভাসা মানবিকতা আর দরিদ্র নারায়ণের প্রীতিতে আবদ্ধ নেই, তিনি তখন সচেতন এক রাজনৈতিক যোদ্ধা। পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্লেষণে তিনি নেমে পড়লেন সরাসরি। যে চ্যাপলিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন, মঁশিয়ে ভের্দু ছবি করার পর সেই চ্যাপলিনের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

চ্যাপলিন কি তাঁর জীবনের শুরুতে লোক হাসাবার কথা আদৌ ভেবেছিলেন? না তিনি তা ভাবেননি। তিনি ছিলেন গভীর জীবনবোধে উদ্দীপ্ত। চ্যাপলিন লিখছেন, 'নাটুকে বংশে জন্ম হওয়ার জন্যে স্বভাবতই রঙ্গমঞ্চের কথাই আমি ভাবতাম। কিন্তু তার লঘু দিকটা আমাকে টানত না। আমি বরং ভাবতাম রোমিও হয়েছি, জুলিয়েটের সঙ্গে পার্ট করছি।'[২০] তিনি লিখছেন, 'ভালো নাটকে গভীর আবেগপ্রবণ ভূমিকায় নামতে আমার ইচ্ছা হতো।' পিছনের দিকে তাকালে আজও মনে পড়ে নিজের ঘরের নিরালা কোণে আমার সেই সসম্ভ্রম মহলা দেওয়া, আমার সযত্ন পদক্ষেপ, আমার মার্জিত ভঙ্গি।' 'হায় কোথায় সেদিনের চার্লি, আর কোথায় আজকের চার্লি।' 'সব সময় আকাঙ্ক্ষা ছিলো থিয়েটারের পয়লা নম্বরের অভিনেতা হবো বা নায়ক গোছের তারকা-টারকা। আমার সব পরিশ্রম, সব প্রচেষ্টা, সব জানা-বোঝার লক্ষ্য ছিলো ঐদিকে। আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি হব হাস্যরসিক, ওটা একটা দুর্ঘটনা'।[২১] তিনি লিখছেন, 'আমার ভাঁড়ের মতো উদ্ভট অঙ্গভঙ্গিগুলো খুব সফল হতো।' 'যে কারণে গ্যালারিতে ভিড় করা গাঁয়ের ছেলেদের জয়ধ্বনি, 'পিট' থেকে চটপটে হাততালির আওয়াজ আর স্টলগুলো থেকে ভাঙ্গা গলায় যে গর্জন উঠতো আমার অভিনয়ের তারিফ করে, তা কিন্তু আমার প্রাণে নাড়া দিত না। আমি তখনও স্বপ্ন দেখছি সিরিয়াস অভিনেতার, যাকে বলে 'ঋজু' ভূমিকা তাতে অভিনয় করার, আর ওদিকে দর্শকের মধ্যে যে উৎসাহের সঞ্চার আমি ঘটাতাম তা দেখে আমার রাগ হতো। আমার সাফল্যকে আমি অনাদর করতাম।'[২২] কারণ 'উচ্চতর শিল্পের সন্ধানে ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার সুযোগ আমায় দেওয়া হলো না। রঙ্গ-তামাশার লোক হিসাবে আমায় ইতিমধ্যেই দেগে দেওয়া হলো।' তিনি নিজের সম্পর্কে লিখছেন, 'মনের কষ্টে এক ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে তাকে বললাম, ভাঁড়ামো করে করে আমি ক্লান্ত। আমি একটা আসল নাটকে অভিনয় করতে চাই। শ্রোতাদের আমি শিহরিত করতে চাই।' কিন্তু ম্যানেজার কাছে এসে বললেন, 'দেখো ভায়া, তুমি হলে জাত কমেডিয়ান, বড় ট্র্যাজিডিয়ান হতে চেয়ে তোমার চিন্তার অপচয় করছ কেন? আরে ভায়া দুনিয়াটাকে হাসাও। সেটাই বেশি কাজে লাগবে।'[২৩] চ্যাপলিন মানুষকে হাসাতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন সমাজ সম্পর্কে গভীর কথাগুলো গভীরভাবে বলতে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, চ্যাপলিন লিখছেন, 'আমাকে ছুড়ে দিল রঙ্গ-তামাশার আবর্তের মধ্যে। আমাকে করে তুলল ফিল্ম জগতের ভাঁড়'। হাস্যরস সৃষ্টিতে যিনি পৃথিবীতে এখনো শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয়, কী গভীর বেদনা নিয়ে নিজের জীবনীতে তিনি বারবার একথা লিখেছিলেন তা আমাদের বুঝতে হবে। সত্যিকার অর্থেই হাস্যরস ধাক্কা দিয়ে মানুষের ঘুম ভাঙাতে পারে না, ইবসেনের সিরিয়াস নাটক 'নোরা' যা পেরেছিলো।

শিল্পবস্তু বা নাটক এক ধরনের বার্তা। সেজন্য প্রধান বিচার্য, শিল্পবস্তুর সংস্পর্শে দর্শক-পাঠক-শ্রোতা মানুষের মনে কী কী আবেগ বা ভাবনার উদয় হলো, সেই আবেগ-ভাবনা-চিন্তার উদ্রেক করা কতোটা সঙ্গত। গ্রীসের প্রাচীন যুগে এ্যারিস্টটল অভিনয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কণ্ঠস্বরের সঠিক ব্যবহারের দ্বারা বিভিন্ন আবেগ প্রকাশ'। কারণ প্রাচীন গ্রীসের ঐ বিশাল থিয়েটারে দেখার চেয়ে শোনার ব্যাপারটাই ছিলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের লক্ষ্য ছিলো সেখানে নাগরিকদের সাথে চিন্তার আদান-প্রদান। নাগরিকদের নানা ধরনের তথ্য প্রদান। প্রমিথিউস বাউন্ড ব্যতীত এসকাইলাসের সব নাটকেই রাষ্ট্রীয় বিষয় কিংবা শাসন সংক্রান্ত মতামত গুরুত্ব পেতো। গ্রীসের অন্যান্য নাট্যকারদের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে সত্য। নাটকে সেখানে শাসকদের সমালোচনারও অঙ্গ ছিলো। গ্রীসে কী বলা হচ্ছে নাটক সম্পর্কে? ছেলেপিলেদের জন্য শিক্ষক আছেন তিনিই তাদের শেখাবেন। কিন্তু বয়স্কদের শেখাবেন কে? কবিরাই তাদের শিক্ষক। নাট্যকারদের তখন কবি বলা হতো এবং নাট্যশালাকেই মনে করা হতো বয়স্কদের পাঠশালা। কিন্তু পরবর্তীকালে রোমে আমরা দেখতে পাই, নাটক ভিন্ন চরিত্র গ্রহণ করছে। রোমে আমরা গ্রীসের নাটকের মতো চিন্তার আদান-প্রদান লক্ষ্য করি না। নাটক সেখানে শুধুমাত্র বিনোদনের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য রোমের অভিনেতারা তাঁদের পূর্বসুরি গ্রীক অভিনেতাদের মতো সামাজিক মর্যাদা পাননি।

স্মরণ রাখতে হবে, রোমের অধিকাংশ অভিনেতারা ছিলেন দাসশ্রেণী থেকে উদ্ভূত যাদের কোনো নাগরিক অধিকার ছিলো না। জাতে এঁরা ছিলেন নিছক পেশাদার আমোদদাতা, ভবঘুরে নিম্নশ্রেণীর মান-মর্যাদাহীন মানুষ, যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টায় হৈ-হুল্লোড়প্রিয় জনতাকে আনন্দদানের চেষ্টা করতো। সংলাপ বলার চেয়ে মজাদার বজ্জাতি এবং নানারকম অঙ্গভঙ্গির দ্বারা তাৎক্ষণিক হাস্যরসের উদ্রেক করে তাঁরা দর্শকদের মাতিয়ে রাখতেন। এই সকল দলের সঙ্গে অভিনেত্রী হিসাবে থাকতো গণিকারা, যাঁরা প্রয়োজনে স্ত্রী-ভূমিকা বা নর্তকীর দায়িত্ব পালন করতো। বহু পরে ষোল শতকে আমরা এই পদ্ধতির নাট্য প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি কমেডিয়া ডেল আর্তে। সেখানে কোনো নাট্যকারের রচনা ছাড়াই দশ থেকে বারোজন অভিনেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক কথোপকথন সৃষ্টি করে দীর্ঘ তিন ঘণ্টা কি আরো বেশি সময় দর্শকদের হাসির তুফানে মাতিয়ে রাখতেন। কথোপকথন ছিলো এইক্ষেত্রে নিছক অনুষঙ্গ, পরিবর্তে আঙ্গিক অভিনয় বা হাঁটা চলা এবং উদ্ভট মঞ্চক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলো। নাটকের কাহিনী বা সংলাপকে গৌণ করে প্রতি অভিনেতা একাধিক মঞ্চক্রিয়া খুঁজে বের করতেন যেগুলি নিছক অবাস্তব ও হাস্য-উদ্দীপক। ডিগবাজী খাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক কলাকৌশল যা সাধারণত সার্কাসের ক্লাউনের কার্যকলাপের সাথে মেলে। নাট্যকারের ভূমিকা অগ্রাহ্য করে, নাটকের ব্যাখ্যা বাতিল করে দিয়ে, ইটালির কমেডিয়া ডেল আর্তের অভিনেতারা বলতে চেষ্টা করেন মঞ্চেই নাটকের যথার্থ বিকাশ ঘটে। কিন্তু এই ধারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না, নাট্যকারের গুরুত্ব অচিরেই প্রমাণিত হতে থাকে। যখন বড় বড় নাট্যকাররা মঞ্চ কাঁপিয়ে তুললেন, কমেডিয়া ডেল আর্তের রঙ্গ-তামাশা স্তিমিত হলো। চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় কমেডিয়া ডেল আর্তের ধারা থেকেই এসেছিলো কিন্তু বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে নয়। চ্যাপলিন লিখছেন, কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা প্রচণ্ড হাসির উদ্রেক করে। দর্শককে হাসতে হাসতে পাগল করে তোলাটা কোনো কোনো অভিনেতার স্বপ্ন। কিন্তু আমি চাই হাসিটাকে ছড়িয়ে দিতে। পেট ঘুলিয়ে ওঠে তেমন হাস্যরোলের চেয়ে আমি পছন্দ করি ছোটো ছোটো হাস্যরোল। কিন্তু স্বভাবতই তাকে আমি ভাঁড় বানাবো না, তারমধ্যে থাকবে বুদ্ধিদীপ্ততা। কমেডিয়া ডেল আর্তের অভিনেতারা বুদ্ধিদীপ্ততাকে বাদ দিয়ে শুধু লোক হাসাতেই ব্যস্ত ছিলেন, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অধিক নাট্যদলের কাম্য।

বাংলাদেশে যাঁরা হাসির নাটককে সমালোচনা করেছেন, সেই সকল ব্যক্তিবর্গরাও বিভিন্ন সময় নিজ দলের প্রয়োজনে হাসির নাটক মঞ্চায়ন করেছেন যেখানে দর্শকদের

বিনোদন দেয়া ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য ছিলো না। শিল্পে বিনোদনের উপাদান থাকবেই। শেক্সপীয়ারেও ছিলো, চ্যাপলিনেও আছে। কিন্তু সত্যিকারের শিল্পকর্ম আনন্দ দেওয়াতে শেষ হয়ে যায় না। বরং সেখানে আনন্দ দেয়া-নেয়ার ভিতর দিয়েই জীবনের অনেক সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষের অনুভূতির কেন্দ্র হাইপোথ্যালামাস-এ যা ধাক্কা দেয়, সে বিনোদন নেহাতই দুর্বল। চিন্তার কেন্দ্র গুরুমস্তিষ্ক 'সেরিব্রাল কর্টেক্স'-এ যা নাড়া দিতে পারে, তাই হলো সবল বিনোদন। সব বিনোদনই সহজাত প্রবৃত্তি আর আবেগকে নিয়ে কারবার করে না। আরো বড় লক্ষ্যে পৌঁছুতে চায়। বিনোদনে ব্রেশট তাই আপত্তি করেননি। কারণ ব্রেশটের ক্ষেত্রে কিছু শেখা, জগৎকে জানতে পারার মধ্যে রয়েছে একটা বড় বিনোদন। শিল্প প্রসঙ্গে একই কথা বলছেন এ্যারিস্টটল। তিনি লিখছেন, যদিও অনেক জিনিস দেখা বেদনাদায়ক, যেমন অতিনিকৃষ্ট জীবজন্তু কিংবা শবদেহ, কিন্তু শিল্পে যখন তার অতি নিখুঁত প্রতিরূপ দেখি তখন আমরা আনন্দ পাই। এর কারণ হলো যে-কোনো কিছু শিক্ষা মাত্রেই আনন্দদায়ক। আর তা শুধু দার্শনিকের পক্ষেই সত্য নয়, সমস্ত মানুষের পক্ষেই সত্য। তাদের বিদ্যাবুদ্ধি যতোই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, একটি মানুষ ছবি দেখতে দেখতে আনন্দ পায় কারণ মানুষ ছবি দেখতে দেখতে শিক্ষালাভ করছে। সে সঞ্চয় করছে বস্তুর নানা তাৎপর্য। এ্যারিস্টটলের কাছে শিক্ষা মানে শুধু অজানা জিনিসই জানা নয়, যেটা আগে নির্বিশেষভাবে জানা ছিলো সেটাই বিশেষভাবে জানা। জানা বিষয়টাকেই আরো ভালো করে জানতে হয়। দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসে আমরা যেসব জিনিস দেখি না বা ভালো করে খেয়াল করি না, সত্যিকারের শিল্প বা নাটক আমাদের তাই দেখতে সাহায্য করে।

বিনোদন মানে শুধু হাসি আর হুল্লোড় নয়, বিনোদন শব্দটির সীমা অনেক ব্যাপক। ধ্রুপদী সঙ্গীতে যখন কেউ মনোনিবেশ করে তা একধরনের বিনোদন লাভের জন্যই। শুধু হাসি নয়, কান্নাও এক ধরনের বিনোদন। নইলে মেলোড্রামা চলতো না, কান্নার ছবি দেখার জন্য ভিড় জমতো না। বিনোদন সম্পর্কে নানা সংকীর্ণ ধারণা প্রচলিত রয়েছে সমাজে। যুক্তি ও বুদ্ধি মানুষের সহজাত, যেমন সহজাত মানুষের আবেগ। সব মানুষই চিন্তাশক্তি নিয়ে জন্মেছে, জীবনের সবক্ষেত্রে তা অল্প বিস্তর কাজেও লাগায়। কিন্তু যে শিল্প সংস্কৃতি তার এই বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দেয়, তার চিন্তাশক্তিকে বাড়তে দেয় না, সেই শিল্পই আসলে অশ্লীলতাকে লালন করে। **রক্তকরবী** নাটক যে দেখতে যায় সেও বিনোদন লাভ করতেই যায় এবং যে **বেদের মেয়ে জোসনা** দেখতে যায় সেও বিনোদন লাভ করে। কিন্তু কার কোনটাতে লাভ, মানসিক বিকাশ ঘটে সেটাই বিচার্য। টলস্টয় লিখেছেন, 'জনসাধারণকে যে কাব্য আনন্দ দেয় সেই কাব্যই প্রকৃত কাব্য, উত্তম কাব্য। যথা মহাভারত। পন্ডিত-মূর্খ, বৃদ্ধ বালক, পাপী-পুণ্যবান সকলেই এ কাব্য শুনে আনন্দ পায়।'[২৪] কিন্তু তা কি কোনো হাস্যরসের জন্য? বালক হয়তো কাব্যের কাহিনী বা প্লট শুনে মুগ্ধ। বলদৃপ্ত যুবা হয়তো কর্ণার্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা শুনে বীর রসে লুপ্ত, বৃদ্ধ হয়তো শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনের আত্মসমর্পণ দেখে ভক্তিরসে আপ্লুত এবং উদারচরিত্র সর্বরসে রসিকজন হয়তো প্রতি ঝংকারে প্রতি মীড়ে প্রকৃত কাব্য রসে নিমজ্জিত। নিছক হাসির নাটকের বিরুদ্ধে যেখানে সকল বড় বড় স্রষ্টার প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে সেখানে মলিয়েরকে আরো বেশি হাস্যরসাত্মক করতে গিয়ে এখানকার নাট্যদলগুলোর কেউ কেউ তাদের প্রযোজনাকে খিস্তির আখড়ায় পরিণত করেছে। সেজন্যই নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এক প্রবন্ধে আতাউর রহমান লিখেছিলেন, বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে রুচির অবনতি হয়েছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অর্ধশিক্ষা মানুষের শিল্পবোধ ও রুচিকে আক্রান্ত করেছে। নাট্যাঙ্গনও এই আগ্রাসন থেকে রক্ষা পায়নি।[২৫] নাট্যাঙ্গনে শুধু হাসি নয়, পরবর্তীতে তার মধ্যে নানা রকম খিস্তি ও অশ্লীলতাও ঢুকে পড়ে। ঐ একই প্রবন্ধে তাই আতাউর রহমান লিখেছেন, 'দর্শক কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, অমার্জিত ও অশ্লীল সংলাপ ও মঞ্চক্রিয়ায় বেশি মজা পায়। রুচিশীল, শাণিত ও সুন্দর সংলাপ আজ দর্শকের মনোরঞ্জন করতে প্রায়শই ব্যর্থ হচ্ছে।'

বাংলাদেশের নাটকে অশ্লীলতাকে প্রাধান্য দেয়া প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়, ঢাকার উল্লেখযোগ্য দলগুলোর মধ্যে কুরুচির লক্ষণ প্রথম দেখা যায় ঢাকা পদাতিকের বিভিন্ন প্রযোজনায়। ঢাকা পদাতিকের আশির দশকের প্রযোজনা **ইন্সপেক্টর জেনারেল**, **ইংগিত**, **এই দেশে এই বেশে**, **আহ কমরেড**এসব প্রযোজনায় যথেষ্ট কুরুচির ইঙ্গিত ছিলো। বাংলাদেশের নাটকে কুরুচি আমদানি বা তার প্রয়োগে ভারতের জাতীয় নাট্যবিদ্যালয় থেকে স্নাতকপ্রাপ্ত অনেকের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে লম্ফঝম্ফ আমদানি করে নাটককে বহুক্ষেত্রে তাঁরা সার্কাস বানিয়ে ফেলেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সেই ধরনের নাটকের কিছু প্রযোজনা দেখার পর শম্ভু মিত্র লিখেছিলেন, 'আমরা সবাই দিশেহারা অধঃপতনের পথে হু হু করে নেমে এসেছি। আমাদের চিন্তার বিন্যাস নেই, আবেগের ভদ্রতা নেই।'[২৬] তিনি আরো লিখছেন, 'যতো অভদ্র ভাষায় কপচানো হয়, ততোই জোর হাততালি পড়ে। কিন্তু সে শিল্প সংস্পর্শে দর্শকের মন উন্নত হয় না। লড়াই করবার জন্য নৈতিক জোর আসে না বুকে, ক্রোধ আসে না, আসে কেঁউচেমি।'[২৭] যার ফলাফল পশ্চিমবঙ্গের নাটকের জন্য যেমন ভালো হয়নি, তেমনি বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনকেও তা ক্ষতি করেছে। নব্বই ও আশির দশকে সোলায়মান মোটাদাগের কিছু নাটক লিখেছিলেন। নাট্য আন্দোলনের লোকরা তার সমালোচনা করা প্রয়োজন বোধ করেননি। বরং বহু নাট্য ব্যক্তিত্বই তাঁর পিঠ চুলকে দিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় নাট্যবিদ্যালয়ের স্নাতকদের নাটকের লম্ফঝম্ফ নিয়েও কেউ প্রশ্ন তোলেননি। পরবর্তীতে বাংলাদেশের বহু নাট্যকার ও নির্দেশক নাট্য রচনা ও প্রযোজনায় লম্ফঝম্ফ বা কুরুচিকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। দিকপালদের মতিভ্রম দেখে উত্তরসূরিরাও দিগভ্রষ্ট হয়েছেন। দিকপালদের তথাকথিত জনপ্রিয়তা দেখে নবাগতরাও তাদের পন্থা অনুসরণ করে চলেন। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, 'বহু শিল্পীর অধঃপতন হয় এভাবে। একদা যাঁরা ক্ষয়িষ্ণু ও প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পকলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর শিল্প সৃষ্টিতে নবচেতনা আনবার প্রতিজ্ঞা নেন, উত্তরকালে দেখা যায় তাঁদের মধ্যে অনেকেই সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ ও অর্থপ্রাপ্তির প্রলোভনে পড়ে নিজেদের ঘোষিত আদর্শ থেকে অনেকখানি দূরে সরে যান এবং ব্যবসায়িক জগতের নিকৃষ্ট শিল্পকলার কাছে আত্মসমর্পণ করেন।'[২৮]

নব্বইয়ের দশকেই খাঁটি দেশীয় নাট্য বা লোকনাট্যের নামে শুরু হয় নাট্য প্রযোজনায় বিভিন্ন খেমটা নাচ-গান। বিভিন্নরকম অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিরও সেখানে দেখা মেলে। এই সকল নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত মন্তব্য করেছিলেন যে, সবাই খাঁটি দেশীয় থিয়েটার সৃষ্টির সৃষ্টিছাড়া নেশায় কৌতুকের গান গাইছে, কোমর দোলাচ্ছে, দুনিয়া বহির্ভূত পোশাক পরে হঠাৎ হঠাৎ নাটকের মাঝে ঢুকে পড়ে সবচেয়ে সস্তা সবচেয়ে অশ্লীল সবচেয়ে কুৎসিত কিছু লোকগীতি গেয়ে রসিকতা করছে। তিনি আরো লিখছেন, ইদানীং বোম্বাই, দিল্লি, কলকাতা সর্বত্র শিক্ষাগর্বী একদল সুবেশ ছেলেপিলে লোকনাট্য লোকনাট্য করে ছাতারের নৃত্য শুরু করেছেন। কিন্তু তারা মঞ্চে যা আনছেন তা স্বপ্নে দেখা বা বইয়ে পড়া লোকনাট্য, বাস্তব লোকনাট্যের সাথে যার কোনো মিল নেই। তিনি দেখাচ্ছেন যে, লোকশিল্পকে আজকের প্রেক্ষাপটে কাজে লাগাতে গেলে লোকশিল্পের পুরো ইতিহাসটা জানতে হয় এবং বর্তমান শিল্পকলাকে নখদর্পণে আনতে হয়। তা না করে, কোনোরকম বিদ্যা-বুদ্ধি ছাড়াই লোকনাট্যের নামে যা যা করা হচ্ছে, তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি। কিন্তু নাটকে প্রকাশিত হওয়া উচিত জনতার বেদনা ও গভীরতর বিদ্রোহ চেতনা।[২৯]

থিয়েটার-এর নাটকে সাধারণত লম্ফঝম্ফকে প্রশ্রয় না দিয়ে অভিনয়কে গুরুত্ব দেয়া হতো। সেই থিয়েটার পর্যন্ত কুরুচিকে

এড়াতে পারেনি। স্থূল নানা সংলাপের সমাবেশ ঘটেছিলো থিয়েটারের **এখনও ক্রীতদাস** নাটকে। নাটকটিতে খুব গালাগাল ও খিস্তি ব্যবহার করা হয়েছে। গালাগাল বা খিস্তি ব্যবহার সম্পর্কে আবদুল্লাহ আল মামুনের নিজস্ব বক্তব্যটি আগে আমরা এখানে তুলে ধরবো। এখনও ক্রীতদাস মঞ্চে আসার বহু পরে, পঁচাশি সালে তিনি এক নিবন্ধে লিখছেন, 'সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু নাটকে অহেতুক গালাগাল প্রয়োগ করার প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তব, নিষ্ঠুর বাস্তব, কঠোর বাস্তব ইত্যকার যুক্তির স্কন্ধে ভর দিয়ে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রাত্যহিক জীবন থেকে এমনসব কথাবার্তা তুলে আনা হচ্ছে, যা দিয়ে আর যাই হোক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে না। ভাবা হচ্ছে যে, একটা বিরাট কিছু হ'লো–আত্মতৃপ্তি পাওয়া যাচ্ছে যে, জীবন থেকে সংলাপ তুলে এনে ছড়িয়ে দিলাম চারদিকে।'[৩০] তিনি আরো লিখছেন, 'কিন্তু আমার ধারণায়, এতে করে নাটকের শরীরে ঘামাচি উঠছে, ফোস্কা পড়ছে, আজকের নাট্যকারকে এই দিকটা ভাবতে হবে।'[৩১] এই সব বক্তব্য যিনি দিচ্ছেন তিনিই আবার তাঁর নাটকে গালাগাল ব্যবহার করেছেন নির্দ্বিধায়। বস্তি-জীবনের গালাগাল নাটকে এত মুহুর্মুহু ব্যবহৃত হয়েছে যে, গালাগালের হুলোড়ে নাটকের আসল উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়। এখনও ক্রীতদাস নাটকের প্রথম সংলাপটি হচ্ছে কান্দুনির। কান্দুনি নেপথ্য থেকে বলছে, 'কুন্ হারামীর বাচ্চা, কুন্ ভাতারখাকী আমার গাতার পানি লইছে? আমি জিগাই, অই বান্দীর বাচ্চারা, অই হালার পো-রা, এই মাগীরা, যুদি সাহস থাকে ত আয়, আমার সুমখে আয়, স্বীকার যা কে আমার গাতার পানিতে আত দিছে।'[৩২] মর্জিনা তার বাপ বাক্কা মিয়াকে বলছে, 'আমার হাত ছার শালা–ছার্ ছার্...'।[৩৩] সারা নাটকই এ ধরনের গালাগাল বা স্থূল সংলাপে পূর্ণ। হারেছের সংলাপ, 'অহন কেমুন লাগতাছে? ধইরা খারা কইরা রাখছিলাম পাছার মইদ্যে পিপড়ায় কামড় দিছিলো।' বাক্কা মিয়া হারেছকে বলছে, 'তোর চক্ষে মুখে আমি পেচ্ছাপ করুম।'[৩৪] আবদুলাহ আল মামুনের এই সব সংলাপের ভিতর দিয়ে তাঁর দেয়া বক্তব্যের সাথে তাঁর স্ববিরোধিতা ফুটে ওঠে। বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতাদের বক্তব্যে আমরা এ ধরনের স্ববিরোধিতা বারবার লক্ষ্য করবো যা নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে তাদের সততার ব্যাপারটিকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

মমতাজউদ্দীন আহমদের **সাত ঘাটের কানাকড়ি** নাটকে আছে বিদঘুটে কিছু স্থূল সংলাপ। যেমন নায়ক বলছে নায়িকাকে, 'যদি তোমাকে ছায়াছবির খচ্চর মার্কা নায়িকার মতো অর্ধ উলঙ্গ করে দেই'। 'তুমি ন্যাংটা হয়ে নাচবে আমি ষাঁড়ের মতো ফাল দেব।'[৩৫] অন্য কিছু সংলাপ, 'শালার বউটা মোটা হয়েই যাচ্ছে। চর্বির গোডাউন। পাঁচশো লোককে ঐ চর্বি দিয়ে পরোটা ভেজে খাওয়ানো যাবে।'[৩৬] 'প্রস্রাব করতে গেলাম, প্রস্রাব হল না।' 'যেখানেই যাই ফুল গাছ। কুত্তার বাচ্চা বাঙালী প্রস্রাব করার জায়গা রাখেনি।'[৩৭] মাকে মেয়ে বলছে, 'তুমি বুকের আঁচল খুলে আজনবী চিড়িয়ার মতো মেলাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, তোমাকে মাস্তানরা সিটি মারছিলো।' মা মেয়েকে বলছে, 'সাবাস, তুই আমার এ্যাসেট, আমার ডলার, আমার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক'। 'তোকে নিয়ে যেখানে যাব, সেখানেই মেলা বসে যাবে'।[৩৮] সুস্থ সংস্কৃতির কথা বলে এঁরা আসলে কলমের ডগায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছেন। তবুও নিজেদের সৃষ্টি সম্পর্কে কী নিরঙ্কুশ অহংকার ছিলো। শম্ভু মিত্র এঁদের সম্পর্কে লিখছেন, সামান্য জনপ্রিয়তার লোভে মোটাদাগের দৃশ্য লিখে দিতে এঁদের বাধে না।[৩৯] সেজন্য নব্বইয়ের দশকের শেষে এসে নাট্য-অভিনেতা আলী যাকের এক সাক্ষাৎকারে অকপটে স্বীকার করেছেন, 'সংস্কৃতির যে দুরবস্থা এটার জন্য আমরা সবাই দায়ী। সামগ্রিকভাবে চিন্তাটা লঘু ব্যাপারে চলে এসেছে এবং এই লঘু ব্যাপারের জয় জয়কার চলছে। এবং সেটাতে আমরা কিন্তু মশলা দিচ্ছি।'[৪০] সেই সাক্ষাৎকারে তিনি একথাও বলেছেন, নাট্যদলগুলো অনেক দূরে সরে এসেছে তাদের ঘোষিত আদর্শ থেকে।[৪১]

দিকপালরা যে নানাভাবে দিগভ্রষ্ট হয়েছিলেন তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। নাট্যাঙ্গনের দিকপাল বলে পরিচিত সৈয়দ শামসুল হক রচিত **খাট্টা-তামাশা** ও **মুখোস** নাটকে কুরুচির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। দর্শককে সুড়সুড়ি দেবার জন্য এবং অকারণে কিছু স্থূল সংলাপ ব্যবহার করেছেন তিনি। মুখোস নাটকের কিছু সংলাপ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। 'স্ত্রী' এই নাটকের প্রধান একটি চরিত্র, সে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর ধর্ষণের শিকার হয়েছিলো। ধর্ষণের আগে পুরুষ যে-সকল সংলাপ বলেছিলো বহু বছর পর স্ত্রী চরিত্রটি তা উচ্চারণ করছে পুরুষটির গলা নকল করে। সংলাপগুলো, 'আরেকটু, আরেকটু ঢোকাও। দিস বিচ ক্যান টেক এ বিট মোর।' 'ইউ সিওর ডক্টর? শালী যদি মরে যায় এখানে?' 'মরবে? টনটনে জ্ঞান আছে। গিভ ইট টু হার। ভেতরে। বেশ করে।'[৪২] 'এই, খিদে পেয়েছে? খাবি? লম্বা, মোটা শক্ত। খাবি না? পেট ভরে যাবে।' 'আরে বেটি, তুই জিনিস বড় হেভি। বল, তোর ভাতার কটা? বল হারামজাদী, বল।'[৪৩] মুক্তিযুদ্ধের স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে পুঁজি করে নাট্যকার দর্শকদেরকেই এসব সংলাপ শোনাতে চেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রের নামে

রক্ত করবী নাটকে খালেদ খান ও অপি করিম

একসময় ধর্ষণের দৃশ্য দেখিয়ে দর্শককে সুড়সুড়ি দিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছিলো একদল লোক। শামসুল হক তাই করেছেন এ নাটকে। ঐ নাটকেই একজন পুরুষ সম্পর্কে স্ত্রী স্বামীকে বলছে, 'এই প্রথম বা নতুন নয় যে আমার সামনে উনি ওঁর ঐ প্যান্টের বোতাম খুলে বের করবেন।' পরে পুরুষটিকে বলছে, 'কাম অন, ডক্টর। স্ট্যান্ড আপ। আমার ঘর আপনি পেচ্ছাব করে ভাসাবেন, সেটি হচ্ছে না।'[৪৪] আর একটি সংলাপ, 'জানেন ডক্টর, এই মাগীগুলো কাপড় তোলার জন্য তৈরি, আর যদি একটু মিউজিক বাজালেন তো আপনাকে দুই ঠ্যাং দিয়ে জড়িয়ে ধরবে।'[৪৫] নাট্যকার এভাবেই দর্শককে সুড়সুড়ি দেবার জন্য নাটকটাকে তিনি রগরগে করে তুলতে চেয়েছেন। নাটকটা প্রযোজনা করেছে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়।

বলতেই পারেন যে কেউ, খিস্তি খেউর এসব তো বাস্তব জীবনে আছে। অবশ্যই আছে। কিন্তু প্রশ্ন, নাটকে তা তুলে আনলে লাভটা কী? তার দ্বারা তো আমাদের চিন্তা বুদ্ধিভিত্তিক হয় না, আমাদের দৃষ্টিও বিজ্ঞানসম্মত হয় না। বড়জোর তাতে কিছু হাততালি পড়তে পারে। দর্শককে কিছুটা বিকৃত প্রমোদ বিতরণ করা যেতে পারে। কিন্তু শিল্প তো নিছক প্রমোদের আপ্তবাক্যের আফিম হিসাবে ব্যবহৃত হবার নয়। শিল্প মানুষের বোধের একটা হাতিয়ার। বিজ্ঞান যেমন পৃথিবীকে বুঝবার অস্ত্র, শিল্পও তেমনি মানুষকে বুঝবার, মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বুঝবার একটা অস্ত্র।[৪৬] রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক যুক্তিভিত্তিক অনুসন্ধিৎসা ছিলো। তিনি বাস্তব পৃথিবীকে সেভাবেই বুঝতে চেয়েছেন। সমাজ সম্পর্কে মানুষ সম্পর্কে তাঁর কিছু নিজস্ব বক্তব্য ছিলো এবং সেই বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন এমন এক নাট্যরূপে, যা ক্লাসিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য তাঁকে খিস্তি করতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়ার ইবসেনের কাছে আমাদের বারবার ফিরে যেতে হয়, কিন্তু বাংলাদেশের কোনো নাটক কি ক্লাসিকের সেই সম্মান পেয়েছে, যার কাছে যুগে যুগে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে? পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চা প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র বলেছেন, বেশিরভাগ নাটকই আমাদের গভীর অন্বেষায় সাহায্য করে না। আমাদের নাটকের ঐতিহ্যের মধ্যে বুদ্ধির ভাগ কম, হালকা হৃদয়াবেগ বেশি।[৪৭] বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে সত্য। মঞ্চের মধ্যে বুদ্ধিকে প্রসারিত করবার যে চেষ্টা তার সঙ্গে আজকের মঞ্চায়িত বেশিরভাগ নাটকের কোনো যোগ নেই। বাংলাদেশের মঞ্চে এখন কুরুচির পুজো চলে। নামী-দামী নাট্যকার বা নাট্য-ব্যক্তিত্বরা যখন ব্যাপকভাবে পঙ্কিলতায় নিমগ্ন তখন কুরুচির দাপাদাপি মাতামাতি স্বাভাবিক। বিভিন্ন দল বা ব্যক্তির এ ধরনের প্রযোজনা সম্পর্কে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'প্রতিষ্ঠা অর্জন ও অর্থাগমের পথ তাঁদের এভাবে সুগম হয়–কিন্তু শিল্পের মারাত্মক ক্ষতি করে যান–বহুবছরেও যার ক্ষতিপূরণ হয় না।[৪৮] শম্ভু মিত্র এই ধরনের স্থূল সংলাপ সম্পর্কে বলছেন, তা দর্শকের রুচিকে বিকৃত করবার এবং শিল্পকে শ্বাসরুদ্ধ করবার পাঁয়তারা। তিনি আরো লিখছেন, বিকৃত রুচির পরিবেশনে অভ্যস্ত হয়ে শেষে এমন এক সময় আসবে যেদিন সত্যিকার শিল্পেরই আর কোনো আবেদন থাকবে না জনসাধারণের মধ্যে।[৪৯] সত্যিকার শিল্প কী লোকে আর ধারণাই করতে পারবে না। লোকে যা কিছু একটা বানিয়ে শিল্প বলে চালিয়ে দেবে। লোকে তখন খিস্তি করাটাকেই শিল্প বলে মনে করবে।

নাট্য প্রযোজনায় আরণ্যক নাট্যদলকে কখনো কুরুচিপূর্ণ দৃশ্য বা অশালীন সংলাপ ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। কিন্তু স্টুডিও থিয়েটারের প্রযোজনায় মামুনুর রশীদও তাঁর **মানুষ** নাটকে এমন ধরনের গালাগাল ব্যবহার করেছেন যা এই প্রবন্ধে উচ্চারণযোগ্য নয়। বহুজন মনে করেন গালাগাল ব্যবহার করে তাঁরা নাটককে বাস্তব করে তুলছেন। নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই তাঁরা এসব কথা বলেন। মানুষের হৃদয়-মন ছুঁয়ে যাবার মতো সংলাপ তাঁরা রচনা করতে পারেন না বলেই, কুরুচিপূর্ণ সংলাপ ব্যবহার করে দর্শকদের আকৃষ্ট করেন এবং তাদের রুচিকে নষ্ট করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার এসব করা দরকার হয় না। রক্তকরবীর মতো নাটক লিখবার যোগ্যতা থাকলে কাউকেই বাস্তবতার দোহাই দিতে হয় না। শ্রমিকরা বাস্তব জীবনে গালাগাল করলেও বাস্তবতার নামে রবীন্দ্রনাথ শ্রমিকদের দিয়ে গালাগাল করাননি। তিনি শ্রমিকদের জীবনের গভীর বিষয়গুলোকেই সামনে এনেছেন। যাদের নাটকে গভীরতা থাকে না, তাদেরকে বাস্তবতার নামে খিস্তি করতে হয়। ধ্রুপদী নাট্যকার এ্যারিস্টোফানিসের ভেক নাটকটিতে আমার বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে। নাটকটির গল্প হচ্ছে, নাট্যকলার পৃষ্ঠপোষক দেবতা দিউনিসাস এথেন্সের সাম্প্রতিক নাট্যকারদের সৃষ্টিকর্মে আনন্দ ও তৃপ্তি না পেয়ে ভৃত্য জানথিয়াসকে নিয়ে হেরাক্লিসের ছদ্মবেশে পাতালপুরীতে হেডিসের উদ্দেশ্য যাত্রা করেছেন। স্মর্তব্য যে, ইতিমধ্যে ইস্কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস তিন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক নাট্যকারই মৃতুবরণ করেছেন। দিউনিসাসের ইচ্ছা ইউরিপিডিসকে নাট্য রচনার জন্য আবার তিনি মর্ত্যে ফিরিয়ে আনবেন। পথে দিউনিসাসের সাথে হেরাক্লিসের যে বাক্য বিনিময় হয় সেগুলো এখানে খুব উল্লেখযোগ্য। হেরাক্লিস জানতে চায়, এতো কবি জীবিত থাকতে কী উদ্দেশ্যে দিউনিসাস সুদূর হেডিস পর্যন্ত কষ্ট করে যাবে। উত্তরে দিউনিসাস বলেন, আমার এমন একজন কবি চাই যিনি লিখতে পারেন। আজকাল দুরকম কবি আছেন, কেতাদুরস্ত চতুর ও মসৃণ আর মৃত। হেরাক্লিস জানতে চান, সফোক্লিসের পুত্র তরুণ ইয়োফোনের কি হলো? দিউনিসাস উত্তরে বলেন, একমাত্র ওর মধ্যেই কিছু পদার্থ আছে, তাও আবার আমি খুব সুনিশ্চিত নই। হেরাক্লিস তখন বলেন, কিন্তু কয়েকজন তরুণ কবি তো গিজগিজ করছে আর একটার পর একটা ট্র্যাজিডি লিখে যাচ্ছে। বাগাড়ম্বরের দিক থেকে সেইটিই যদি তুমি চাও, ইউরিপিডিস তো তাদের কাছে তুচ্ছ। দিউনিসাস তখন উত্তর দেয়, ওরা সব চুনোপুঁটি। কোনো কাজের নয়। শুধু চড়ুই পাখির মতো কিচিরমিচির করতে জানে। নিজেদের শিল্পকলার ক্ষেত্রে কলঙ্ক স্বরূপ। দ্বিতীয়বার আর তাদের নাম শোনা যায় না। ওদের সারা দঙ্গলে খুঁজে তুমি একজন সত্যিকার শক্তিশালী মৌলিক কবি পাবে না যে একটি আকর্ষণীয় উদ্দীপক চরণ রচনা করতে পারে। তিনি আরো বলেন, যে কবি প্রকৃত দুঃসাহসী কিছু সৃষ্টি করতে পারেন আমি এইরকম কবির কথা বলছি।[৫০] কবি বলতে তৎকালে নাট্যকারদেরই বোঝানো হতো। পাখির মতো কিচিরমিচির বলতে যারা গভীর বিষয় বাদ দিয়ে নাটকে হৈ হুল্লোড়কে স্থান দেয় তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রাচীন কালে রচিত ভেক নাটকের সংলাপ পাঠ থেকে বোঝা যায়, সস্তা শিল্প-সাহিত্য সবকালেই ছিলো এবং সস্তা সাহিত্যেই অশালীনতার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বহুজনই নিজ নিজ সাহিত্যে অশালীনতার প্রয়োগ নিয়ে গর্বও করে থাকেন। সেজন্য থর্নটন ওয়াইল্ডারের **আইডিয়াজ অব মার্চ** গ্রন্থে প্রাচীন রোমে সেমপ্রুসিয়া তাঁর বন্ধু জুলিয়া মার্সিয়ার কাছে ব্যঙ্গ করে লিখছেন, 'আজকাল বিশুদ্ধ ইতরভাষা বলাটা সপ্রতিভ হওয়ার লক্ষণ'। ঐ একই গ্রন্থে সীজারের সময়কালের কবিতা সম্পর্কে লেখা হচ্ছে, ডিক্টেটরের বিরুদ্ধে রচিত ব্যঙ্গ কবিতাগুলো তীব্র ও অশালীন কিন্তু তাতে যুক্তি আছে সামান্য। দু-একটি ছাড়া সবগুলোই অশ্লীল বাক্যে রচিত। যাঁরা বাস্তবতার নামে অশালীন শব্দ ব্যবহার করেন তাদের স্মরণ রাখতে হবে, পর্নো শিল্প-সাহিত্যে যা দেখানো হয় তাও একধরনের বাস্তব। বাস্তবতার নামে জুলিয়ান-বেকদের মতো বহু নাট্যকার ও নাট্য নির্দেশক মঞ্চে নারী-পুরুষকে নগ্ন করে সঙ্গমের দৃশ্য দেখিয়েছিলো। পিকাসোর **আঙুলবদ্ধ বাসনা** নাটকে দেখানো হয় নারীর স্বমৈথুন-ক্রিয়া। বাস্তবতার নাম করে কি আমরা সেই পথ ধরে আগাবো? বাংলাদেশের নাটকে ইতিমধ্যেই যে-সকল কুরুচিপূর্ণ সংলাপ বা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে, সেই প্রচেষ্টাগুলোই বিভিন্ন দলের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে, দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে মহীরুহ হয়েছে। সুস্থ-সংস্কৃতির কথা ভুলে যাচ্ছে অনেকেই। ফলে

সমাজ পরিবর্তন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এসব মুখে বলা হলেও বেশিরভাগ দলগুলোরই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে দর্শক শিকার করা। দর্শককে যে-কোনোভাবে মঞ্চে আনতে হবে এবং টিকেট বিক্রি করতে হবে। সেক্ষেত্রে যে-কোনো ধরনের অপসংস্কৃতি প্রচারেও বহু নাট্যদলের আর কোনো আপত্তি নেই। সমাজচিন্তা এখন তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, দর্শকের মনোরঞ্জন করাই প্রধান বিষয়। সেজন্যই চটুল গল্প ও চটুল সংলাপ নিয়ে মাতামাতি এবং স্থূল সংলাপের বাড়াবাড়ি।

বাংলাদেশে এবং সর্বত্রই বহু শিল্পী নামধারী আছে যারা কেবল জগৎসভায় নিজেকে অন্যরকম বলে চালিয়ে দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালায়। মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রাগ্রসর একটি অংশ রয়েছে বৈকি যাদের ত্যাগ তিতিক্ষা এবং জ্ঞান ও সংগ্রাম সমাজকে পথ দেখাচ্ছে। বাকি যে পশ্চাদবর্তী মধ্যবিত্তরা রয়েছেন তাঁরা তো নৈরাশ্যবাদী, ভোগী এবং অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ। এঁরাই হলেন সমাজশক্তি, তাঁদের ভিতর থেকেই আসেন আমাদের বৃহৎ সংখ্যক শিল্পীবৃন্দ, আমাদের নাট্যকাররা। যাঁদের বেশির ভাগের লক্ষ্য থাকে সস্তায় কিস্তি মাৎ করার। মূলত ভোগের জন্য তাঁরা টাকা অর্জনের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন শিল্প সৃষ্টির নামে। শিল্পের অঙ্গনে এঁরাই একটা শ্বাসরোধকারী অবস্থা তৈরি করেছেন। কার কাজ শিল্পাঙ্গনের এই ব্যাধিকে নিরাময় করা? নাম লেখানো বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিবাদী লোকের অভাব নেই বাংলাদেশে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করা বা প্রগতিবাদী দায়িত্ব পালন করছেন না কেউই। মাঝে মাঝে নাট্যাঙ্গনের নেতারা সংবাদপত্রে নানা ধরনের মহান আদর্শের বুলি ঝাড়েন এবং পরদিন তাঁদের দেখা যায় সস্তা নাটকের উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা দিতে। তাঁরা শুধু নাটক উদ্বোধনই করেন না, প্রশংসামূলক ছাড়পত্রও প্রদান করেন এবং দলবাজিতে যুক্ত হয়ে পড়েন। ফলে দেখা যায়, দলবিহীন মহত্তর শিল্পীকে তুচ্ছ করে, নিন্দা করে নিজ দলের অনেক নিম্নস্তরের শিল্পীকে নিয়ে মাথায় করে নাচা হয়। পত্র-পত্রিকা এই কাজটি আরো ভালো ভাবে করে থাকে। মহত্তর শিল্পীদের চেয়ে জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে তারা বেশি নাচানাচি করে। সত্যিকারের শিল্পকে বাদ দিয়ে গ্লামারের পেছনে ছোটে। যে সমাজ সৎ প্রচেষ্টা ও অপচেষ্টা উভয়কেই তুল্যমূল্য জ্ঞান করে সে সমাজ পিছিয়ে যেতে বাধ্য। দেশ তাই প্রতিদিনই পিছিয়ে যাচ্ছে। যদি দেশের পত্র-পত্রিকা এবং শিল্পকলার বাঘা বাঘা লোকরা তাদের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতো তাহলে দেশের নৈতিক চরিত্রের এতো অধঃপতন হতো না।

নাট্য আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন সবাই সেটাকে ইতিবাচকভাবে দেখলেও প্রথম থেকেই নানারকম প্রশ্নও দেখা দিয়েছিলো। ছিয়াত্তর সালে আনু মুহাম্মদ লিখছেন, নাটকের অগ্রযাত্রাকে আন্দোলন বলে অভিহিত করবার আগেই ভাববার প্রয়োজন আছে যদি এ নাটক-স্রোত আন্দোলন হয় তবে নাট্যকর্মীরা এই আন্দোলন কী জন্যে, কাদের জন্যে করতে চাইছেন? কী তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য? তিনি লিখছেন, বর্তমানে যেসব নাটক পরিবেশিত হচ্ছে সীমিত পরিসরে সেগুলোর চরিত্র প্রশ্নাতীত নয়...সামাজিক শ্রেণীগত দিক থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং সীমাবদ্ধতার কারণে সেসব নাটক কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাপ্ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত। তিনি আরো লিখছেন, 'সবচেয়ে গুরুতর দুর্বলতা যেটি আমি মনে করছি সেটা হচ্ছে কোনো কোনো গোষ্ঠী ও বহুসংখ্যক কর্মীর মধ্যে আদর্শ এবং লক্ষ্যের অভাব কিংবা আদর্শ ও লক্ষ্যের বিচ্যুতি।'[৫১] নাটকের বিষয়বস্তু ও সামগ্রিক দিকটি নিয়ে অনেকেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। থিয়েটার পত্রিকায় তিয়াত্তর সালেই অসীম সাহা লিখছেন, 'স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নাট্যচর্চার একটি তীব্রতম প্রবাহ লক্ষ্য করা গেলেও, তা আপাত চমকে যতখানি আলোড়নে সমর্থ, নাট্যিক গুণাগুণের যথাযথ প্রতিফলনে ততখানি নয়।'[৫২] নাট্য আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত একজন নাট্যকার নুরুল করিম নাসিম তিয়াত্তর সালেই লিখছেন, 'এটা আনন্দের এবং আশার বিষয় প্রচুর নাটক হচ্ছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে আন্দোলন শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে আলোড়ন। এই আলোড়ন এবং আবেগ আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে আমরা জানি না।'[৫৩] কিন্তু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পর তো দেখতে পাচ্ছি নাটক কোন গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। নাটক সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার, কিন্তু বাংলাদেশের নাটক সমাজ পরিবর্তনে কি কোনো ভূমিকা রাখতে পেরেছে? প্রতিদিন মঞ্চে নাটক দেখার পরও সমাজটা কি পিছিয়ে গেছে, না এগিয়েছে সে বিচারের ভার পাঠকদের উপর রইলো।

তথ্যসূত্র: ১. শম্ভু মিত্র, সম্মার্গ-সপর্যা, কলকাতা : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৬, পৃ. ৪৫। ২. নাসির উদ্দিন ইউসুফ, 'অন্য থিয়েটারের সন্ধানে', জাতীয় নাট্যোৎসব ১৯৯৮, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন আয়োজিত নাট্যোৎসবের স্মরণিকা, পৃ. ১১। ৩. ঐ। ৪. নুরুল করিম নাসিম, 'আজকের নাটক ও দর্শক সমস্যা', থিয়েটার, ১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা, মে ১৯৭৩, পৃ. ৭৭। ৫. জনৈক, 'প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসব : পর্যালোচনা', থিয়েটার, ৫ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা, আগস্ট ১৯৭৭, পৃ. ১৬৩-৬৪। ৬. শাহরিয়ার কবির, 'নাট্য আন্দোলনের সমস্যা', থিয়েটার, ৩য় বর্ষ : ২য় সংখ্যা, আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ৯১। ৭. ঐ, পৃ. ৯৬। ৮. দ্রষ্টব্য, বাংলা থিয়েটার ও মামুনুর রশীদ, নাট্যপত্র, প্রস্তুতি সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৫১। ৯. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, 'নাগরিকের দেওয়ান গাজীর কিসসা', থিয়েটার, ৬ষ্ঠ বর্ষ : ২য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১০৫-১০৬। ১০. আতাউর রহমান, 'বাংলাদেশের নাটক নতুন প্রজন্মের সমস্যা ও সম্ভাবনা', নাট্যপত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০। ১১. নাট্যপত্র, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত, 'যবনিকা উত্তোলন' দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখিত নয়। ১২. মামুনুর রশীদ, 'আমাদের সংস্কৃতি', জাতীয় নাট্যোৎসব ১৯৯৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১। ১৩. দ্রষ্টব্য আতাউর রহমান, 'বর্তমানের মঞ্চ-নাটক ও আমরা', জাতীয় নাট্যোৎসব ১৯৯৮, পূর্বোক্ত পৃ. ৩৫। ১৪. রঁম্যা রলাঁ, পিপলস থিয়েটার, রথীন চক্রবর্তী অনূদিত, কলকাতা : পুস্তক বিপণী ১৯৯৬, পৃ. ৪৪-৪৬। ১৫. দ্রষ্টব্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা, কলকাতা : ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, ১৯৭৮, পৃ. ২৬। ১৬. দ্রষ্টব্য, চিঠিপত্র, মধুসূদন রচনাবলী, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৯ পৃ. ৫২৪। ১৭. চার্লি চ্যাপলিন, 'কী করে আমি সফল হলাম', নাট্যচিন্তা, চার্লি চ্যাপলিন সংখ্যা, মে-অক্টোবর ২০০০, পৃ. ২৬০। ১৮. মৃণাল সেন, 'শিল্পীর সংগ্রাম : চ্যাপলিনের জীবন', নাট্যচিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯-৩০। ১৯. ঐ, পৃ. ৩১। ২০. চার্লি চ্যাপলিন, 'আমার ছেলেবেলার স্মৃতি', নাট্যচিন্তা, পূর্বোক্ত পৃ. ২৪৮। ২১. চার্লি চ্যাপলিন, 'কী করে আমি সফল হলাম', পূর্বোক্ত পৃ. ২৬০। ২২. চার্লি চ্যাপলিন, 'আমার ছেলেবেলার স্মৃতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫০। ২৩. ঐ, পৃ. ২৫০। ২৪. দ্রষ্টব্য, সৈয়দ মুজতবা আলী, 'চার্লি চ্যাপলিন', নাট্যচিন্তা, পূর্বোক্ত পৃ. ৮৫। ২৫. আতাউর রহমান, 'বাংলাদেশের নাটক নতুন প্রজন্মের সমস্যা ও সম্ভাবনা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭। ২৬. শম্ভু মিত্র, প্রসঙ্গ : নাট্য, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৭১, পৃ. ১৩। ২৭. ঐ, পৃষ্ঠা ১৬। ২৮. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০। ২৯. উৎপল দত্ত, গদ্যসংগ্রহ, ১ম খন্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮, পৃ. ৩৯৩-৩৯৫। ৩০. আব্দুল্লাহ আল মামুন, 'স ংলাপ, তুমি কার, কে তোমার?' থিয়েটার, ১২তম বর্ষ : ১ম-২য় যুগ্ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ১৩৩। ৩১. ঐ। ৩২. আবদুল্লাহ আল মামুন, এখনও ক্রীতদাস, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৪, পৃ. ২। ৩৩. ঐ, পৃ. ৪। ৩৪. ঐ পৃষ্ঠা ১৩-১৪। ৩৫. মমতাজউদ্দীন আহমেদ, সাতঘাটের কানাকাড়ি, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৯১, পৃ. ২১। ৩৬. ঐ, পৃ. ১৪। ৩৭. ঐ, পৃ. ৪৫। ৩৮. ঐ, পৃ. ৩৮-৪০। ৩৯. শম্ভু মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১। ৪০. সাক্ষাৎকার : আলী যাকের, সাপ্তাহিক ২০০০, ২য় বর্ষ : ১৫তম সংখ্যা, ২০শে আগস্ট, ১৯৯৯, পৃ. ৩৬। ৪১. ঐ, পৃ. ৩৪। ৪২. সৈয়দ শামসুল হক, 'মুখোস', থিয়েটার, ৩২তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, মার্চ ২০০৩, পৃ. ২৪। ৪৩. ঐ পৃ. ২৭। ৪৪. ঐ, পৃ. ৩০। ৪৫. ঐ, পৃ. ৪৭। ৪৬. শম্ভু মিত্র, প্রসঙ্গ : নাট্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭। ৪৭. ঐ পৃ. ১৩৫। ৪৮. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃ. ৩০। ৪৯. শম্ভু মিত্র, সম্মার্গ-সপর্যা, পূর্বোক্ত পৃ. ২। ৫০. এ্যারিস্টোফানিস, 'ভেক', কবীর চৌধুরী অনূদিত, উত্তরাধিকার, ১১তম বর্ষ : ৭ম-৯ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, পৃ. ৮২-৮৩। ৫১. ঐ। ৫২. অসীম সাহা, 'বাংলাদেশের নাটক : অন্তর্গত উপলব্ধি', বাংলাদেশের নাট্যচর্চা, ঢাকা : মুক্তধারা ১৯৮৬, পৃ. ১৬৪। ৫৩. নুরুল করিম নাসিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।

ছবি : **শাকুর মজিদ**